



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 548 - 557

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ইকোট্রিসিজম বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে কমল চক্রবর্তীর সাহিত্যের বিশ্লেষণী পাঠ (নির্বাচিত গ্রন্থ অবলম্বনে)

বন্দনা সাহা

গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: bandanasouthhabra@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Eco-criticism,
Nature,
Wildlife,
Animal,
Forest,
Endangered,
Awareness,
Marginalized.

Abstract

Eco-criticism is a literary theory which was established as a distinct field in the late 20th century. William Rueckert first introduced the word 'Eco-criticism' in 'Literature and Ecology: An Experiment in Eco-criticism' (1978). He emphasizes ecology but does not focus on the relationship with man and animal. Cheryll Glotfelty gave the perfect definition of Ecocriticism in his book— 'The Ecocriticism Reader' (1996). According to Cheryll— 'Eco-criticism is the study of the relationship between literature and the physical environment.' The literary theory based on relationship between literature and environment, where the main topics of discussion are fascination with the exquisite beauty of nature, nature and humans, the endangerment of nature and wildlife, human values and human awareness.

Kamal Chakraborty was born on 30 December, 1944, in Bangladesh. After completing engineering degree Kamal joined as a worker in Telco Company, Jamshedpur. Sometimes he escaped from his job and went to the forest for a long time. He starts 'kabita camp'. Kamal Chakraborty is a nature lover. He purchased a huge amount of rough dry land for tree plantation. He made an institution named 'Bhalopahar'. It is natural that tree, forest, and wildlife would become a major foundation in the writings of Kamal Chakraborty, who is known as 'Brikkha Manab'. Many of his writings have become narratives of love for nature. Not only that, he is fascinated by the beauty of nature, he is also grateful for nature's generous gift. His work is tree centered, and trees are his religion. In this article, Brikkhanath Kamal Chakraborty's life and philosophy will be explained and analyzed. Four main aspects can be found in his writings. Firstly, how did the author express his fascination about the exquisite beauty of Mother Nature? Secondly, the lives of marginalized people associated with forest and depression by the civilized society. Thirdly, the abused or tortured animal how to make a united struggle against people? Fourthly, the author's groan to see the devastation of females and nature. The author wants to raise awareness of impending danger to people.

Discussion

(১)

মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠে প্রাণের প্রথম স্পন্দন, মায়ের সঙ্গে তার নাড়ির টান। মায়ের কোল সন্তানের প্রথম আশ্রয়, মাতৃদুগ্ধ তার প্রথম খাদ্য, মায়ের স্পর্শে জেগে ওঠে অনুভূতি, মায়ের হাত ধরে আলাপ হয় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। সৃষ্টির উষ্মালগ্নে আদিম পৃথিবীতে প্রকৃতি সেই মা আর প্রত্যেকটি প্রাণের স্পন্দন তার সন্তান। তাই প্রকৃতি মায়ের সঙ্গে জীবজগতের নিবিড় বন্ধন, হৃদয়ের গভীর সংযোগ। সন্তানকে সে দু-হাত ভরে দিয়েছে, মমতাময় স্নেহের শ্যামল আঁচল বিছিয়ে রক্ষা করেছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু সেই মা আজ বিপন্ন। নিজেকে উজার করে অকাতরে দান করা মা আজ নিজেই নিজের সন্তানের দ্বারা নির্যাতিত। দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত চিত্তে সে কথাই বলেছেন তাঁর প্রবন্ধে—

“মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান; ক্রমে সে নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ হারালো; যে তার প্রথম সুহৃদ...সেই তরুণতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা ক’রে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে।”^১

আদিম বনচারী মানুষ বিবর্তনের ইতিহাসে নিজেকে তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজিত করেছে (অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম)। আর সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে অরণ্যচারী থেকে সে ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান নির্ভর, আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার প্রভুত্বকামী মানুষ। সে ছুঁয়েছে আকাশের নীলিমা, পা রেখেছে মহাকাশের মাটিতে, জয় করেছে শৃঙ্গ। কিন্তু ক্ষমতার দস্তে সে ভুলেছে তার অতীত, অহংকারের আফ্রিকানে নিজের মাকেই করে চলেছে নিঃস্ব-রিজ-শূন্য। প্রকৃতির সঙ্গে জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরতার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। প্রকৃতি বা পরিবেশের ক্ষয় ও ক্ষতিসাধনে তাদের পারস্পরিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। শিল্পায়ন, নগর উন্নয়ন, ভোগবাদী স্বার্থে প্রকৃতির ওপর নির্বিচারে শোষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুটের ধ্বংসযজ্ঞ পৃথিবীকে চরম সংকটের মুখে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যে পৃথিবীতে একটু একটু করে প্রাণের বিকাশ ঘটেছিল বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা মানুষের যথেষ্টাচারে তা বিলুপ্তির পথে হাঁটছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদী আগ্রাসন যখন উন্নয়নের নামে ধ্বংসলীলায় মত্ত সেখানে সাহিত্যিক কমল চক্রবর্তী হয়ে দাঁড়ান প্রতিবাদের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। পরিবেশবাদী কোন আন্দোলনে সামিল না হয়েও কমল নিজেই হয়ে ওঠেন এক আন্দোলনের নাম।

(২)

ইকোক্রিটিসিজম বা পরিবেশবাদী তত্ত্বের চিন্তা-চর্চা ও বিচার-বিশ্লেষণ করার আগে এই তত্ত্বের সূচনা ও প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন তাকে বলে পরিবেশ। পরিবেশে বসবাসকারী জীবগোষ্ঠীর পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে বাস্তুতন্ত্র বা Ecosystem বলে। আর বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবগোষ্ঠীর সৃষ্টি, অবস্থান ও পরিবেশের সঙ্গে তার আন্তঃসম্পর্ক আলোচিত হয় তাকে বলে বাস্তুবিদ্যা বা ইকোলজি। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান জীববিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল সর্বপ্রথম ‘ইকোলজি’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ইকোলজি বা বাস্তুবিদ্যা যখন কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার ভিত্তিভূমি হয়ে ওঠে তখন সেই সৃষ্ট সাহিত্যের নাম হয় ইকোটেক্সট। এই যে আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাহিত্য ও ইকোলজির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠেছে যা জন্ম দিয়েছে একটি নতুন সাহিত্যতত্ত্বের যা ইকোক্রিটিসিজম নামে পরিচিত। ইকোক্রিটিসিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন William Rueckert তাঁর ‘Literature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism’ বইতে ১৯৭৮ সালে। তিনি ইকোক্রিটিসিজম বলতে যা বলেছিলেন—

“the application of ecology and ecological concepts to the study of literature.”^২

Rueckert বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তুবিদ্যার ওপর জোর দিয়েছিলেন কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অন্যান্য সম্পর্ক নিয়ে বলেননি। Cheryll Glotfelty প্রথম ‘The Ecocriticism Reader’ (1996) বইতে ইকোক্রিটিসিজম তত্ত্বের মূল কথা বলেন—

“Ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment.”^৩

অর্থাৎ সাহিত্য ও আমাদের চারপাশে গড়ে ওঠা পরিবেশের সঙ্গে যে সম্পর্ক নিয়ে যে তাত্ত্বিক সমালোচনার ধারা গড়ে উঠেছে তাকে ইকোক্রিটিকিজম বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বলে।

এই সাহিত্যতত্ত্ব মূলত নয়ের দশকে গড়ে উঠেছে। সাহিত্য সমালোচনার ধারায় এই তত্ত্বের সংযোজন সাহিত্যকে অনুধাবনের যে বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তবে তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে বেশ কিছু পরিবেশ আন্দোলন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্ব সচেতনতা, সম্মেলন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এর ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে উত্তরপ্রদেশের গাড়ায়েলে অরণ্যরক্ষার জন্য ‘চিপকো’ আন্দোলন, ১৯৭৮ সালে কেরালার পাহাড়ি অঞ্চলে কুস্তী নদীতে সরকারের বাঁধ পরকল্পনার বিরুদ্ধে ‘সাইলেন্ট ভ্যালি’ আন্দোলন, ১৯৮৫ সালে গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে ‘নর্মদা বাঁচাও’ আন্দোলন নগর উন্নয়ন, শিল্পায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বিশ্বজুড়ে ক্ষমতাশালী ও প্রভুত্বকামী মানুষের ভোগবাদী মানসিকতার পরিতুষ্টিতে প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর যে আঘাত নেমে আসতে শুরু করেছে, তা ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে বিপন্ন করে তুলবে আশঙ্কা করে জাতিসংঘ প্রথম পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্ব সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭২ খ্রি. ৫ থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত জাতিসংঘের সম্মেলন হয়, এরপরই ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় ‘United Nations Environment Programme’। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রণীত হয় জলদূষণ সংক্রান্ত আইন, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বায়ুদূষণ সংক্রান্ত আইন, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। প্রতিবছর ৫ জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। কিন্তু এত আইন-কানুন প্রণয়ন করেও পরিবেশ রক্ষা করা যে সম্ভব হচ্ছে না তা প্রতিবছরের ক্রমবর্ধমান বিশ্ব উষ্ণায়নের চিত্র থেকে স্পষ্ট।

সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য সমালোচনা ধারা হিসেবে তাত্ত্বিক স্বীকৃতি পাওয়ার অনেক আগে থেকেই সাহিত্যে পরিবেশবাদী মনোভাব ও প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। ‘ঋকবেদ’ থেকে জানা যায় প্রাচীন মুনি ঋষিরা জলের মধ্যে ওষুধের গুণ খুঁজে পেয়েছেন। অথর্ববেদে ওষুধের মধ্যে জলকেই শ্রেষ্ঠ ওষুধ বলে নির্দেশ করে হয়েছে— ‘ভিষগ্‌ড্যো ভিষরতরঃ’ (১৯/২/৩)। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু প্রথম প্রমাণ করেন গাছের প্রাণ আছে, কিন্তু তার বহু বছর আগে লিখিত ‘মনুসংহিতায়’ বলা হয়েছে— উদ্ভিদ, গুল্ম, লতা প্রভৃতির ভিতরে চৈতন্যবোধ রয়েছে। ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রণয়ন করা হয়। তবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রথম আইন বা নিয়ম চালু করেছিলেন কৌটিল্য। দীর্ঘিতি বিশ্বাস জানান—

“রাজ্যের অনূর্বর জমি - যেখানে ফসল উৎপন্ন হবে না সেইখানে নানারকম বৃক্ষরোপণ করে কৃত্রিম বনসৃজনের কথা বলেছেন কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে। ...এইসব বনাঞ্চলে নানা রকমের পশু-পাখি ছেড়ে দেওয়া হবে রাজার মৃগয়ার জন্য। তবে বনের গাছ নষ্ট করলে বা এইসব সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পশুদের আঘাত করলে বা হত্যা করলে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজা বিভিন্নরকম দণ্ড প্রদান করতেন। সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে কৌটিল্য ‘অভয় বন’ নামে উল্লেখ করেছেন।”^৪

মহাভারতের আদিপর্বে দুশ্মন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যান অবলম্বনে কালিদাস যে ‘শকুন্তলা’ নাটক রচনা করেছেন সেখানেও দেখা যায় মহাকবির প্রকৃতিপ্রীতি এবং প্রকৃতি ও মানব জগতের অপূর্ব মেলবন্ধন। তপোবনে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে শকুন্তলার যে হৃদয়ের টান, তাদের প্রতি স্নেহের মায়া বুঝিয়ে দেয় সেখানে মানুষ ও প্রাণী পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ। এই তপোবনে অরণ্য ধ্বংস বা প্রাণীহত্যা নয় একসাথে বাস করাই মূল ধর্ম। তাই দুশ্মন্ত মৃগয়া করতে তপোবনে প্রবেশ করলে এক তপস্বী তাঁকে নিবৃত্ত করেন।

“দুশ্মন্তের আচরণে প্রতিফলিত হয় সভ্য ও বুদ্ধিমান মানুষের অকারণ প্রাণীহত্যার উল্লাস।”^৫

পেনসিলভেনিয়ার লেখিকা র্যাচেল কারসনের ‘Silent Spring’ (1962) গ্রন্থটি প্রথম বিশ্বজুড়ে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। এই গ্রন্থ পরিবেশ ও প্রাণীজগতের ওপর রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কীভাবে বিশ্বপ্রাণকে নিস্তন্ধ করে দিতে পারে তার বিরুদ্ধে বিবেক পীড়িত সতর্কবাণী। তবে এর অনেক আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা ও

পরিবেশের সার্বিক সংকটের চিত্র উঠে এসেছে। চর্যাপদের সময়কাল থেকেই প্রকৃতি সংলগ্নতা ও প্রকৃতির অনুষ্ণ সাহিত্যচর্চায় স্থান পায়। মধ্যযুগের সাহিত্যেও সেই প্রবণতা অপ্রতুল নয়। আধুনিক যুগে এসে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রসঙ্গ বা মুগ্ধতাই প্রকাশ করেননি, শিল্পায়ন নগর উন্নয়নের নামে পরিবেশের যে সার্বিক সংকট উপস্থিত হয়েছে তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর অসংখ্য লেখায় তাঁর বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে। প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রায় যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠছে রবীন্দ্রনাথের বাণী বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—

“দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর/ লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর।”^৬

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের বাইরের প্রকৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ, প্রকৃতির রূপ-রসের প্রতি মুগ্ধতা, একাধিক রবীন্দ্র কবিতায় পরিবেশ সচেতনতা ও আসন্ন পরিবেশ সংকটের বার্তা, ছিন্নপত্রের অসংখ্য পত্রে পরিবেশ সংলগ্নতা, ‘রক্তকরবী’, ‘মুক্তধারা’-তে যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এছাড়াও উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্পে প্রকৃতির প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত এই চিন্তা-চেতনা-চর্চা বুঝিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব বুঝেছিলেন এবং তাঁর বৃহত্তর পাঠক সমাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

জীবনানন্দকে বলা হয় নির্জনতার কবি। তাঁর ‘বনলতা সেন’ হোক বা ‘বাংলার মুখ’, ‘শিকার’ একাধিক কবিতায় প্রকৃতি ও পরিবেশ জায়গা করে নিয়েছে। বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিমোহিত এক প্রকৃতি পূজারী। তাঁর সাহিত্য সাধনায় সেই ছায়া পড়েছে। এছাড়াও শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, জয় গোস্বামী প্রমুখ কবির কবিতায়, বনফুলের ‘নিম গাছ’, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘গাছ’, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের ‘গাছটা বলেছিল’, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘আন্ধার তাস খেলে আপাতত’, অমর মিত্রের ‘বিভূতিবাবুর দেশ’, ‘গুনি’, ‘কলস পুরের যাত্রা’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘ফুল ছোঁয়ানো’, কিম্বর রায়ের ‘মহাজাগতিক’, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘চিমনি’, ‘সবুজ শামিয়ানা’, ইত্যাদি অসংখ্য ছোটগল্পে এবং বনফুলের ‘ডানা’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘জলতিমির’, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রূপকথা ফিরে আসে’, ভগীরথ মিশ্রের ‘অমানুষনামা’, কিম্বর রায়ের ‘প্রকৃতিপাঠ’, অমর মিত্রের ‘কৃষ্ণগহ্বর’, ‘সবুজ রঙের শহর’ ইত্যাদি উপন্যাসে প্রকৃতি ও পরিবেশ বিভিন্ন আঙ্গিকে উঠে এসেছে। জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, বনফুল প্রমুখ সাহিত্যিকরা যখন পরিবেশকেন্দ্রিক নানাবিধ ভাবনা-চিন্তা, দর্শনের কথা তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরছেন তখন ইকোট্রিসিজম নামক এই সাহিত্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়নি। নয়ের দশকে যখন এই নতুন তাত্ত্বিক প্রস্থানের জন্ম হয় তখন অনেকেই আবার তত্ত্বকে মাথায় রেখেও সাহিত্যচর্চা করেছেন। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই লেখকের সাহিত্যগুণ কমে যায়নি। তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই ধরনের ইকোটেক্সটকে সমালোচকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে সুবিধা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে একেবারে বেদ রচনার সময়কাল থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগের সাহিত্য হয়ে আধুনিক কালের সাহিত্যচর্চায় প্রকৃতি ও পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বারবার। আর এই সাহিত্য পাঠে উঠে এসেছে— প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা, নান্দনিক বোধ, ভোগবাদী মানসিকতায় প্রকৃতির বিপন্নতা, মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান, পরিবেশের সার্বিক সংকটে মানুষের করুণ পরিণতি, মানবিক মূল্যবোধ এবং সচেতনতা। কমল চক্রবর্তীর সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা পুরুলিয়ার দলমা, রুয়াম বেষ্টিত এক নির্জন বিস্তীর্ণ এলাকা, সরকারি খাতায় বান্দোয়ান ডাঙরজুড়ি নামে যার পরিচয়— সেই রুক্ষ, শুষ্ক, পাথুরে, অনুর্বর জমি এখন হয়ে উঠেছে যেন রূপকথার একটুকরো সবুজদ্বীপ। বেসরকারি খাতায় যার নাম ‘ভালোপাহাড়’। প্রায় ১৫০ বিঘা পাথুরে জমিতে লক্ষ লক্ষ গাছ লাগিয়ে যিনি নীরবে সবুজ বিপ্লব শুরু করেছিলেন তিনি শহর থেকে অনেক দূরে প্রচারের আলোর বিপরীতে বেঁচে থাকা বৃক্ষনাথ কমল চক্রবর্তী। যার স্পর্শের জাদুকাঠিতে মরু প্রান্তর ঢেকেছে সবুজের গালিচায়, পাষণ পেয়েছে প্রাণ। নিজের উদ্যোগ ও উৎসাহে অবিশ্বাস্য কর্মপ্রেরণায় তিনি অরণ্য সৃজন করেছেন। নিজের সারাজীবনের অর্জিত অর্থ দিয়ে কিনেছেন বিঘার পর বিঘা রুক্ষ, শুষ্ক, কাঁকুরে জমি। বীজ পুঁতেছেন, গাছ লাগিয়েছেন, করেছেন তাদের পরিচর্যা।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের বিক্রমপুরে কমল চক্রবর্তীর জন্ম। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে জামশেদপুর টেলকো কোম্পানিতে চাকরি নেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবশত বাংলা নিয়ে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে স্নাতকোত্তর পাস করেন। চাকরি করাকালীন ধোঁয়া, ধুলো, কংক্রিটময় জীবন থেকে মুক্তি পেতে বারবার ছুটে যেতেন পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্রে। একদিকে কবিতার প্রতি প্রেম আরেক দিকে প্রকৃতির হাতছানি— শুরু করলেন বন-জঙ্গল ও পাহাড় বেষ্টিত অঞ্চলে বন্ধুদের নিয়ে কবিতা ক্যাম্প। ধীরে ধীরে আপন হয়ে উঠল গাছ, মাটি, জল। ঘর ছেড়ে ঘর বাঁধলেন প্রকৃতির মাঝে। দলবদ্ধ স্বপ্নের জাল কেটে একে একে বেরিয়ে যেতে থাকে বন্ধুরা। কমল স্বপ্নের ক্যানভাসে রঙিন তুলির দাগ টেনে যায় একাকী। লক্ষ লক্ষ গাছ ধরিত্রীর বুকে সবুজের শিহরণ তোলে। জল-জঙ্গল প্রকৃতিকে ভালোবেসে চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নেন কমল। শুরু হয় আরেক জীবন। ফেডেড জিন্স আর রঙিন টি-শার্ট পরিহিত দিব্যকান্তি সুপুরুষ বদলে যান দীর্ঘ সাদা দাঁড়ি, খাটো ধূতির ওপর পাঞ্জাবি ফতুয়াতে। নাগরিক জীবনের সব চাকচিক্য, আভিজাত্য আগুনে পুড়িয়ে তিনি হয়ে ওঠেন ফিনিক্স পাখি।

১৯৯৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভালোপাহাড়ে গাছ লাগানো শুরু হয়। কেবলমাত্র রুক্ষ ধূসর মাটিতে সবুজায়ন নয়, কমল চক্রবর্তী তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়নে আরও একধাপ এগিয়ে যান। চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলেছেন—

“সে এক এলাহি কাণ্ড। হাজার হাজার গাছ লাগিয়েছে। বাচ্চাদের জন্য স্কুল খুলেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আদিবাসী মেয়েদের জন্য নার্সিং ট্রেনিং। ...কত শাকসবজি চাষে শুকনো পাথুরে পাথুরে জমি এখন সবুজ। স্কুলে ২০০ ছাত্রছাত্রী দুবেলা বিনা খরচে খাবার, পোশাক, বইপত্র-কম্বল।”^৭

প্রকৃতি মায়ের ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর পাশাপাশি মায়ের কোলের সন্তানদের জন্য লড়াই শুরু করেন। প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসী জনজাতির জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেন। কমল চক্রবর্তী প্রকৃতি ও প্রকৃতি সংলগ্ন মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেশেন, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে কাছ থেকে দেখেন। তাঁর ভিতরে জারিত হয় লোকসংস্কৃতির বীজ। সেই বীজ তিনি রোপণ করে সংরক্ষণ করতে চান। কমল চক্রবর্তী কেবল মুগ্ধতা প্রকাশ বা প্রকৃতির বিপন্নতাকে উপলব্ধি করে তা লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রতিটি গাছের শিহরণ, অনুরণনকে নিজের শরীরে রক্তের মধ্যে জারিত করেছেন। তাই প্রকৃতি প্রেমে পাগল কমল মধ্যরাতের নিস্তন্ধতায় দু’হাতে গাছকে জড়িয়ে ধরে প্রবল আবেগে বৃক্ষনাথ, হে বৃক্ষনাথ বলে কাঁদতে থাকেন। প্রকৃতিকে এমন হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে যিনি পেরেছেন সেই বৃক্ষমানব বলে পরিচিত কমল চক্রবর্তীর লেখায় বৃক্ষ, অরণ্য, প্রাণীজগৎ অন্যতম ভিত্তিভূমি হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। তাঁর বহু লেখালেখি প্রকৃতি প্রেমের আলেখ্য হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির রূপ-রস সৌন্দর্যে কেবল মুগ্ধতা নয়, তিনি প্রকৃতির অকুপণ দানে কৃতজ্ঞ। বৃক্ষকেন্দ্রিক তাঁর কর্ম, বৃক্ষই তাঁর ধর্ম। তাই কমল চক্রবর্তী বলেন—

“সাহিত্য বিশ্বকে বাঁচাবে না, বাঁচাবে বৃক্ষ। বৃক্ষ আছে, ছিল, থাকবে। বিশ্বকে বাঁচাতে গাছ লাগাও, গাছ। বহুদিন থেকেই বৃক্ষ বন্দনাই আমার দর্শন।”^৮

তাঁর সাহিত্য জুড়ে এই দার্শনিক চিন্তাভাবনাই বারবার প্রতিফলিত হয়েছে।

(৩)

প্রকৃতির রূপ-মুগ্ধতা ও বন্যপ্রেম : কমল চক্রবর্তী জামশেদপুরে কোম্পানির নিশ্চিত জীবন ছেড়ে বারবার প্রকৃতির টানে ঘর ছেড়েছেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত হোক কিংবা ভোরের শিশির ভেজা সকাল, অথবা গ্রীষ্মের দুপুরের দাবদাহের মধ্যে তিনি প্রকৃতির বিচিত্র মোহনীয় রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। অবসর সময়ে ছুটে গেছেন সিমলিপাল, বরাইবুরু, ডুয়ার্স, চাইবাসা, সারাণ্ডাসহ একাধিক জায়গায়। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে বসে দেখেছেন তার অপরূপ সৌন্দর্য, দেখেছেন বন্যপ্রাণীর বন্য রূপের আভিজাত্য। গভীর রাতে রোমাঞ্চকর যাত্রায় শিহরিত হয়েছেন, লিখেছেন সেসব কথা তাঁর বিভিন্ন লেখায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রকৃতি প্রেমের কথা জানিয়েছেন একাধিক লেখায়। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে আজমাবাদ, লবটুলিয়া, ফুলহার সংলগ্ন বিস্তৃত অরণ্যময় অঞ্চলটির পুঞ্জানুপুঞ্জ বিবরণ তুলে ধরেছেন। পাঠক সত্যচরণের চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন সে অঞ্চল, সবুজের ভুবনে পথ হারিয়েছেন বারবার। গাছের সৌন্দর্যে মুগ্ধতা ছড়ায় কমলের চোখে মুখে, বলে ওঠেন—

“যে কোনো গ্রিক ভাস্কর্যের থেকে সুন্দর সারান্ডার শালবন।”^৯

জ্যোৎস্না রাতে আলোর জোয়ার আর শাল গাছের মোহময়ী রূপে ভেসে যান কমল। কখনো বলেছেন—

“টিলার ছাদ থেকে সেগুন বনের ফাঁক দিয়ে কারো নদী দেখা যায়। একদম নীলকান্ত জল। ঠিক সূর্য
ওঠার সময় মনে হবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা নির্জনে এই আশ্চর্য হামামের পাল্লা খুলে রেখেছে।
সাবানের আকশচুসী ফেনায় ভরে যায় সকাল।”^{১০}

মাঝে মাঝে দাবানল বা মানুষের ইচ্ছাকৃত লাগিয়ে দেওয়া আগুনে পুড়তে থাকে অরণ্য। কমল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ব্যথা
অনুভব করেন। তবু তার মধ্যেও খুঁজে পান সৌন্দর্য। কমলের কথায়—

“দল্লার গলা অন্ধকারে দেখা যায় না। শুধু শত শত সাতনরী হার। অন্ধকার ব্যাকগ্রাউন্ডে মণিমাণিক্য
জ্বলে। নেভে না।”^{১১}

কেবল গাছপালা অরণ্যের সৌন্দর্য নয়, তিনি হিংস্র বন্যপ্রাণীর রূপে মোহিত হয়ে যান। বনের রাজা বাঘের হিংস্র
পাশবিকতা মানুষের মনে ভয় আতঙ্ক সৃষ্টি করলেও কমল চক্রবর্তী সেই বাঘের কালো ডোরাকাটা চিত্রল দেহের সৌন্দর্যে
অভিভূত হন। প্রেমে মাতোয়ারা কমল বাঘিনীর শরীরের ঘ্রাণ পায় নাকে। পশু-প্ৰীতি অনেকের মধ্যেই দেখা যায় কিন্তু
বাঘের মতো হিংস্র পশুকে নিজের প্রেমিকা মনে করার সাহস কমল চক্রবর্তীই দেখাতে পারেন। কমল চক্রবর্তী প্রাণীকে
চিড়িয়াখানার খাঁচায় বা বাড়িতে পোষ্য হিসেবে দেখতে ভালোবাসেন না। ঘন অরণ্যের মুক্ত আকাশ তলে স্বাধীনভাবে দেখতে
তিনি ভালোবাসেন। তাই তিনি বলেন—

“ভালোবাসা জেগেছিল। যেন ওকে জড়িয়ে ধরে বলি, তুমি কি কোনদিন জানতে পারবে কতদিন ধরে
কত যৌবন খুইয়ে তোমায় খুঁজেছি। আমি জানতুম একদিন তুমি দেখা দেবে।”^{১২}

এ যেন শতহীন, স্বার্থহীন এক নির্মল পবিত্র ভালোবাসা। যে ভালোবাসা বাঁধনে না বেঁধে মুক্ত আকাশে ভালোবাসতে চায়।
যাকে বলা যায় প্লেটোনিক লাভ। কমল এভাবেই তাঁর ভালোবাসাকে খুঁজে নেয় প্রকৃতির মাঝে।

প্রকৃতি ও প্রান্তিক মানুষ : প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ছিল নিবিড় সম্বন্ধ। কিন্তু বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, যন্ত্রসভ্যতার ক্রমউন্নতিতে সেই
বন্ধন হয়েছে ছিন্ন। প্রকৃতির বুকে বসবাস করা আদিবাসী সমাজের সঙ্গে এ বন্ধন এখনও দৃঢ়। জল-জঙ্গল ঘিরে থাকা এই
প্রান্তিক মানুষগুলো প্রকৃতিকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু সভ্য
সমাজ নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য প্রকৃতির পাশাপাশি এইসব নিরীহ মানুষগুলোর জীবনকেও বিপন্ন করে তুলেছে।
কমল চক্রবর্তী খুব কাছ থেকে প্রান্তিক মানুষের এই সংকটকে দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন।

সভ্য-সমাজ যেখানে নিজের সংস্কৃতি ভুলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অনুকরণ করতে মরিয়া সেখানে প্রান্তিক জনজাতির
এই মানুষগুলো নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রাণ দিয়ে আগলে রাখতে সচেষ্ট। যে কোনো সমাজে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থান
অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অরণ্যকেন্দ্রিক আদিবাসী সমাজে দেখা যায় শারহুল, শিকার উৎসব, পাহাড়
পুজো ইত্যাদি। কিন্তু অরণ্যভূমি ধ্বংসের কারণে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এইসকল সংস্কৃতি। শালফুল ফুটলে তাদের শারহুল উৎসব
হয়। শালগাছ আদিবাসী জনজাতিকে অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ করে, শাল গাছ তাদের কাছে দেবতা স্বরূপ। কমল চক্রবর্তী
লেখেন—

“সরকার লাভের জন্য সেগুন লাগাচ্ছে, এতে আদিবাসীরা ক্রুদ্ধ। ...সেগুনে রূপ নেই, অরণ্য নেই।
প্রভাত সন্ধ্যা, মান-অভিমান, উৎসব নেই।”^{১৩}

আদিবাসী যে কেবল প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে শাল গাছকে ভালোবাসে তা নয়। শাল গাছের সৌন্দর্য, তার ফুলের মোহময়ী
রূপ তাদের পাগল করে, আদিবাসী মন উদাস করে। শাল গাছ ঈশ্বরের সব থেকে সুন্দর সৃষ্টি বলে মনে করে তারা,
শালের সঙ্গে তাদের দিনযাপন, মান-অভিমানের মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক। শাল তাই কেবল গাছ নয়, শাল তাদের কাছে আবেগ।
আমাদের মনে পড়ে যায় চিপকো আন্দোলনের কথা।

প্রান্তিক এই মানুষগুলো বেঁচে থাকার রসদ যোগায় বিভিন্ন পরব বা উৎসব থেকে। শিকার উৎসবে তারা সারাদিন
মহুল, চোলাই, হাড়িয়া খেয়ে তিতর, ময়ূর, হাঁদুর, খরগোশ ইত্যাদি প্রাণী শিকার করে সকলে একত্রে নাচ-গানের আসর
বসিয়ে নিজেদের পদ্ধতিতে রান্না করে খায়। যে জঙ্গল তাদের নিজস্ব বাসভূমি সেই জঙ্গলেই তাদের শিকার নিষিদ্ধ করেছে

সরকার। অথচ প্রতিবছর অসংখ্য চোরাচালান ও চোরাশিকারে বনভূমি নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে পাহাড় পুজো। যে পাহাড় তাদের বেঁচে থাকার আশ্রয়, যার সৌন্দর্যে তারা নেশায় ডুবে থাকে সেই পাহাড় ঘিরে তাদের উৎসব এখন অবলুপ্তির পথে।

প্রান্তিক আদিবাসী সমাজ নিজেদের ধর্মীয় রীতি মেনে চলে। তারা নিজেদের লোকধর্ম ও বিশ্বাস অনুযায়ী পুজো-পাঠ করে থাকে। তারা সিংবোঙা, মারাংবুরু, করম, সরাইবোঙ্গা প্রভৃতি লোকেয়ত দেব-দেবীর উপাসনা করে। ধর্মপ্রচারক বা ধর্মব্যবসায়ীরা আদিবাসীদের একপ্রকার জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ করে। তারা নিজেদের ধর্ম নিয়ে নিজেদের মতো করেই বাঁচতে চায় তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক আদিবাসীকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। কমল দীর্ঘদিন এইসব অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর ফলে আদিবাসী সমাজের ভিতর যে চাপা ক্ষোভ জমা হচ্ছিল তা অনুভব করেন। সে কথাই তিনি লিখেছেন—

“আদিবাসী শেষ করার জন্য গির্জা বানালে, একটা পাহাড় পেরুলেই চোখা চোখা সব লাল মাথা মোরগ ঝুঁটির মতো। তবে আমাদের সিংবোঙা যায় কোথায়! আমরা তো তোমাদের শহরে গিয়ে বোঙার প্রচার করিনি। আমরা তো তোমাদের ঠাকুর দেবতা নিয়ে হাসি মজাক করিনি। অথচ তোমরা সাদা চামড়ার মানুষেরা আমাদের বিরসা ভগবানকে মেরেছো, আমাদের সিধু-কানুকে মেরেছো। এখন আবার ভদ্র ভদ্র মুখ করে যিশু বাবা করতে এসেছ।”^{১৪}

একটা সমাজ যারা কোনো রকম ক্ষতি না করে কেবল নিজেদের মতো থাকতে চেয়েছে। সভ্য সমাজ সেটুকু অধিকারও কেঁড়ে নিতে তৎপর।

সভ্য মানুষ ক্ষমতার গর্বে অকৃতজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু এই সকল জনজাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রকৃতি সংলগ্ন হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। প্রকৃতি মায়ের অসীম দানে তারা কৃতজ্ঞ, আপ্লুত। সুবিধাবাদী পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে বেঁচে থাকার সেই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করতে চায়। অরণ্যধ্বংস করে মন্দির, বড়ো বড়ো টুরিস্ট লজ, বাঁধ নির্মাণসহ আরও একাধিক উপায়ে আদিবাসীকে উচ্ছেদ করতে চায়। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন কীভাবে অধিকারের লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। জীবনের বিনিময়ে হলেও কেমন করে আমৃত্যু অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। কমল চক্রবর্তী আবারও সেই প্রতিবাদের, প্রতিরোধের সংগ্রামকে স্মরণ করিয়ে দেন। আদিবাসী ফৌজি মাংসা সোরেন গ্রামে ফিরে সরকার প্রকল্পিত বাঁধ নির্মাণের পথে প্রাচীর স্বরূপ দাঁড়ায়। সরকার থেকে তাকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও নিজের জন-জাতিকে রক্ষা করতে ঘৃণা ভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। স্বার্থলোভী মানুষ যেখানে নিজেরটুকু ছাড়া কিছুই বোঝে না। মাংসা সোরেন সেখানে নিষ্ঠীক চিন্তে প্রতিবাদে মুখর হয়। সে বলে—

“প্রয়োজনে সরকারের ডেরা উড়িয়ে দাও, ইঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ারের জিপ পাহাড় থেকে নদীতে গড়িয়ে দাও। আগে দশটা জিপ, বিশটা বাবুর লাশ সুবর্ণরেখা নিক, পরে আমাদের জমি যাবে।”^{১৫}

অনিবার্যভাবেই মাংসা সোরেনকে মরতে হয়। ‘মুক্তধারা’ নাটকের অভিজিৎ যেমন যন্ত্রসভ্যতা ও প্রভুত্বকামী মানুষের ক্ষমতার নিদর্শন বাঁধ ভেঙে মুক্তি দিয়ে গেছে। নাটকে পাই—

“যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।”^{১৬}

কমল চক্রবর্তী লেখাটিকে অন্যমাত্রা দিয়েছেন মৃত মাংসা সোরেনের মেয়ে কুরথির কার্যকলাপে। বাবার মুখে শোনা রূপকথার মৃত রাজকুমারের মাটি ফুঁড়ে বেঁচে ওঠার গল্প বিশ্বাস করে সে বাবার মৃত পচা লাশ ঘরের মাটি খুঁড়ে পুতে দেয়। রাজকুমার যেমন দুষ্ট রাজাকে মেরে ফেলতে আবার জন্মাবে কুরথির বিশ্বাস তার বাবাও একদিন বেঁচে উঠে আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। আসলে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন বীর বিপ্লবীর মৃত্যু হবে কিন্তু প্রতিবাদ থেমে থাকবে না, আবার কেউ না কেউ এসে নেতৃত্ব দেবে আন্দোলনের।

প্রকৃতির বিপ্লবতা ও প্রতিরোধ : বর্তমান বিশ্বের ভোগবাদী মানসিকতা যথেষ্টহারে অরণ্যধ্বংস ও বন্যপ্রাণী হত্যা করে আখেরে নিজেদের বিপদকেই ডেকে আনছে। যে প্রকৃতির কোলে সে বেড়ে উঠেছে সেই প্রকৃতিই এখন তার রোষের মুখে।

মায়ের গর্ভজাত প্রাকৃতিক সম্পদ অবাধে লুণ্ঠ করে মাকে করে তুলছে নিঃস্ব, রিজ, শূন্য। আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হয় কমল চক্রবর্তীর গলায়—

“মায়ের শরীর কুপিয়ে মানুষ, সোনা, লোহা, তামা, মাইকা, গন্ধক, ফসফরাস। কত পাথর, জল, কয়লা, পৃথিবীর পাঁজরা, মাংস মানুষ খেয়ে খেয়ে, ঢেকুর। ...দেখা যাবে একদিন সব হারিয়ে যাবে শুধু কঙ্কাল, করোটি।”^{১৭}

রবীন্দ্রনাথও যেন একই কথা উপলব্ধি করেছেন যা ‘রক্তকরবী’-তে পাই—

“পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য ব’লে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস।”^{১৮}

খোদাইকরদের দিয়ে রাজার নির্দেশে খনি উত্তোলন আসলে সেই প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন। প্রকৃতিকে তাই তিনি দেখেছেন অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত রূপে। তাই সবুজ, শ্যামল, নরম, কমণীয় বিশেষণে তিনি প্রকৃতিকে দেখাননি। তিনি পৃথিবীকে দেখেন অ্যাসিড আক্রান্ত মেয়ের মতো, যার দন্ধ, মাংস গলে যাওয়া মুখের দিকে তাকানো যায় না। তিনি প্রকৃতিকে তুলনা করেন রেডলাইট এরিয়ার মেয়ে পাচারের সঙ্গে, যার কাছে মানুষ লুকিয়ে যায় কামনাকে তৃপ্ত করতে কিন্তু দেয় না কোনো সামাজিক মর্যাদা, যৌনক্ষুধা মিটলে যাকে অনায়াসে টাকার বিনিময়ে পাচার করা যায়। ঠিক একইভাবে প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত শোষণ করে তাকে ছুড়ে ফেলছে আবর্জনার মতো। লেখক বলতে চান পৃথিবী ও নারী কেউ সুরক্ষিত নয়, কেউ নিরাপদ নয়।

মুনাফালোভী মানুষ প্রতিনিয়ত উন্নয়নের নামে গাছ কেটে চলেছে। শুধু নিজেরা কেটেই ক্ষান্ত দেয়নি, আদিবাসীদের মুনাফার লোভ দেখিয়ে গাছ কেটে ফেলতে প্ররোচিত করেছে। কমল চক্রবর্তী বারবার দেখিয়েছেন আপাত সভ্য সমাজের কোন ফাঁদে পা দেয়নি এইসকল প্রান্তিক সমাজ। তারা প্রতিবাদ করেছে। কেবল গাছ কাটা, খনিজ সম্পদ উত্তোলন করেই প্রকৃতিকে নিক্ষেপ দেয়নি এই সভ্য সমাজ। বহু বন্যপ্রাণীকে অর্থের লোভে হত্যা করেছে, শিকার করেছে। প্রতিবছর বহুসংখ্যক হাতি, হরিণ, গণ্ডার, বাঘ চোরাচালানের শিকার হয়। কমল চক্রবর্তীর ‘পাহাড়’ উপন্যাসে দেখিয়েছেন জঙ্গল বয় পাহাড়কে প্রথমে লোভ দেখিয়ে, তাতে কাজ না হওয়ায় ভয় দেখিয়ে পাহাড়ের প্রাণপ্রিয় হাতিকে হত্যা করায়। এই ঘটনার ফলস্বরূপ লেখক অত্যাচারিত হাতিদের দিয়ে গড়ে তুলেছেন এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধী সংগ্রাম। রামপ্রসাদের (নিহত হাতির) মৃত্যুতে বনের সব হাতি একত্রিত হয়ে জঙ্গল ছেড়ে শহরের পথে পা বাড়ায়। লেখক অসাধারণ ভঙ্গিমায়ে তুলে ধরলেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের ইতিহাস। যারা কেবল দিনের পর দিন অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত তারা যখন রুখে দাঁড়ায়, প্রতিবাদে সোচ্চার হয় তখন শাসক ভয় পেতে বাধ্য। উপন্যাসে পাই—

“উত্তেজিত জনতা, সড়কি, লাঠি, বল্লা, বল্লম এমনকি খোকারা এয়ারগান, পাইপগান, হাতবোমা, যার যা আছে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জোগাড়। মেয়ে-মর্দ ভেদাভেদ নেই। গব্বররা প্রায় দিন দশেক, হাওড়া পেরিয়ে বালি, উত্তরপাড়ার কাছাকাছি। কলকাতা যাওয়ার রাস্তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। নতুবা তেত্রিশটা পায়ের চাপে রবীন্দ্রসেতু ভেঙে মহাকরণে।...পুলিশের টহলদার বাহিনী জিপে ঘুরে যাচ্ছে।”^{১৯}

নিরীহ প্রাণীর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে গণ-অভ্যুত্থানের এ কাহিনি লেখকের অভিনব প্রয়াস যা প্রশংসনীয়।

মানবিক মূল্যবোধ ও সচেতনতা : বৃক্ষের সঙ্গে সহবাসে কমল হয়ে উঠেছেন বৃক্ষময়। তার চিন্তা-চেতনা সমগ্র সত্তা জুড়ে বৃক্ষনাথ। যে অরণ্য তাঁর প্রাণপ্রিয়, যে বৃক্ষসেবায় তিনি ত্যাগ করেছেন নাগরিক আভিজাত্যময় কর্মজীবন, যখন সেই প্রকৃতি মাকে বিপন্ন হতে দেখেন—

“আমি কাঁদি, কেঁদে চিৎকার করি। ভয়ংকর চিৎকারে গলা ভাঙে। ...আমার গাছ ফেরত দে। আমি পৃথিবীর একজন দুঃখী, সর্বহার।...আত্মহত্যা করব, রঘু।”^{২০}

এ হাহাকার, এ আতর্জনাদ একজন বৃক্ষহারী বৃক্ষপ্রেমিকের। মানুষ যখন নিজের সবথেকে কাছের মানুষকে হারায় তখন নিজেকে সর্বহারী মনে করে। কমল চক্রবর্তীর গলায় সেই প্রিয়জন হারানোর বেদনা যা তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। প্রতিনিয়ত মানুষের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন দেখে তাঁর মধ্যে যেন প্রতিশোধের আগুন জ্বলে। সে কারণেই বোধহয় তাঁর গল্পের

নায়ক হয়ে ওঠে হাতি, বাঘ, গাছ আর আদিবাসী প্রান্তিক মানুষ। তিনি চান তারা তাদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে নিজেরা রুখে দাঁড়াক, প্রতিশোধ নিক এই অত্যাচারের। ‘বৃক্ষ’ উপন্যাসে তাই নায়ক হয়ে ওঠেন গাছপাগুলি মাস্টারমশাই এবং স্বয়ং গাছ। তাই তিনি শুনতে পান পৃথিবীর সমস্ত গাছ তৈরি হচ্ছে। ফিশফিশ পাতায় পাতায় গভীর ষড়যন্ত্র করছে তারা। বৃহত্তর গ্লোবাল ষড়যন্ত্র। গাছে গাছে টেলিপ্যাথি হয়ে গেছে। হাইড্রোজেন বোমা বানানো শেষ। ধ্বংস হয়ে যাবে মানব সভ্যতা। আসলে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা লেখক নিজে ভাবছেন না, তিনি পাঠককুলকে বোঝাতে চাইছেন। এ ভয় তিনি নিজে পাচ্ছেন না, এ ভয় তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন যাতে গাছ কাটার আগে মানুষ সচেতন হয়। কমল চক্রবর্তী জানেন মানুষ অকৃতজ্ঞ, তাই পৃথিবী কতটা বিপন্ন, কতখানি নিঃস্ব তা তিনি আর বোঝাতে চান না। স্বার্থপর সুবিধাবাদী মানুষ তখনই নিবৃত্ত হবে যখন সে বিপন্নতার আঁচ তার নিজের গায়ে লাগবে। তাই এ অভিনব কৌশলে তিনি সচেতনতা গড়ে তুলতে চাইছেন।

সাহিত্যে পরিবেশ চেতনার বহিঃপ্রকাশ বহু পুরাতন কাল থেকে চলে এসেছে। তবে পরিবেশবাদী ভাবনা-চিন্তা যখন নয়ের দশকে তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তখন সচেতনভাবেই সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। কমল চক্রবর্তীর সাহিত্যে একটা বড়ো অংশ জুড়ে প্রকৃতি-চেতনা বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উঠে এসেছে। সাহিত্যকে মাধ্যম করে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর প্রতিবাদ। ভালোপাহাড় সেই প্রতিবাদের বাস্তব উদাহরণ। শুধুমাত্র প্রকৃতি সচেতনতা গড়ে তোলা নয়, পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন, সম্পদ উত্তোলন, বন্যপ্রাণী ও প্রান্তিক মানুষকে অত্যাচার করে স্বার্থান্বেষী মানুষ তার নিজের বিপদকেই ডেকে আনছে। কমল চক্রবর্তী গড়ে তুলেছেন বৃক্ষ ধর্ম, বৃক্ষ দর্শন। একমাত্র দেবতা বৃক্ষনাথ, যার কাছে কমল চক্রবর্তীর শেষ আশ্রয় নয় প্রতি মুহূর্তের আশ্রয় নিতে চান।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘পল্লীপ্রকৃতি’, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৬৮, পৃ. ৮৬
২. Rueckert, William. ‘Literature and Ecology : An Experiment in Eco-criticism’. Oxford press, 1978, p. 7
৩. Glotfelty, Cheryll. Fromm, Harold. ‘The Ecocriticism Reader’. Athens, Georgia 30602, university of Georgia press, 1996, p. xviii
৪. বিশ্বাস, দীপ্তি, ‘প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পরিবেশ ভাবনা’, পরিকথা, একবিংশতি বর্ষ, ২০১৯, পৃ. ১৭৪
৫. মজুমদার, দিলীপ, ‘কালিদাসের শকুন্তলা : ইকোট্রিটিসিজমের আলোকে’, পরবাস, সংখ্যা ৭১, জুন ২০১৮
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘চৈতালি’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩০৩, পৃ. ৩৬
৭. চৌধুরী, যোগেন, ‘বনে যদি ফুটলো কমল’, আর্থপত্র, কমল চক্রবর্তী ৭৫ সম্মাননা সংখ্যা, বইমেলা ২০২০, পৃ. ১৭-১৮
৮. চক্রবর্তী, কমল, ‘বৃক্ষ বেদ’, কৌরব প্রকাশনী, বইমেলা ২০২৪, পৃ. ২৯
৯. চক্রবর্তী, কমল, ‘প্রিয় ফরেস্টার’, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, ২০১৪, পৃ. ১৬
১০. তদেব, পৃ. ৩
১১. চক্রবর্তী, কমল, ‘অরণ্য হে’, লংজার্নি পাবলিশার্স, ২০১৭, পৃ. ২৩
১২. চক্রবর্তী, কমল, ‘প্রিয় ফরেস্টার’, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, ২০১৪, পৃ. ৫৫
১৩. তদেব, পৃ. ১৫
১৪. চক্রবর্তী, কমল, ‘শামু জোনকো’, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, ২০১৬, পৃ. ২৩
১৫. চক্রবর্তী, কমল, ‘মাংসা সোরেন’, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, ২০১৬, পৃ. ১০
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘মুক্তধারা’, কবিতা পাক্ষিক, ১৪১৭, পৃ. ৬২
১৭. চক্রবর্তী, কমল, ‘জঙ্গল’, অভিযান পাবলিশার্স, ১৪২৬, পৃ. ১৮

-
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী', ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ. ৪৭
১৯. চক্রবর্তী, কমল, 'পাহাড়', উপন্যাস সমগ্র ৩, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃ. ১২৭
২০. চক্রবর্তী, কমল, 'বৃক্ষ', উপন্যাস সমগ্র ২, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৭, পৃ. ১১৭